[redacted]

[redacted]

৮ মিলিগ্রাম এবং অল্প বয়স্ক মহিলাদের জন্য প্রতিদিন ১৮ মিলিগ্রাম লোহার প্রয়োজন হয়। মাংস, কলিজা, সীমজাতীয় সবজি, বাদাম, সম্পূর্ণ শস্যদানা যেমন; বাদামি চাল, ঝিনুক, কলা, আপেল, গাঢ় সবুজ শাক-সবজি ইত্যাদি খাদ্য থেকে আয়রন পাওয়া যায়।

জিঙ্ক বা দস্তা: এই উপাদানটি শরীরের বিভিন্ন বিপাকীয় পদ্ধতি যেমন আমিষ সংশ্লেষণ, রোগ-প্রতিরোধক কার্যাবলী, ক্ষত থেকে আরোগ্য লাভের প্রক্রিয়া, কোষ বিভাজন ও ডিএনএ সংশ্লেষণ, টেসটোসটেরন জাতীয় পুরুষ হরমোন তৈরি, মেলাটোনিন তৈরি ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলোকে প্রভাবিত করে থাকে। এছাড়া গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের সঠিক বিকাশ ও বৃদ্ধি লাভের ক্ষেত্রে এবং শিশু বয়সে এবং বয়োসন্ধিকালে শরীরের বৃদ্ধি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপাদানটির অভাবে স্মৃতিশক্তি হ্রাস, রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে ঘন ঘন ঠাণ্ডা লাগা, ডায়রিয়া, ঘুমের সমস্যা, খাদ্যে অরুচি এবং খাদ্যের স্বাদ ও গন্ধ অনুভবের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, চুল পড়া, ত্বকের ক্ষতি ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। উপাদানটির অতিমাত্রার ঘাটতি থেকে হতবুদ্ধিতা জাতীয় মানসিক প্রতিবন্ধকতা, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা এবং যৌন অক্ষমতা দেখা দেয়ার আশংকাও থাকে।

লাল মাংস, হাঁস-মুরগির মাংস, ঝিনুক ইত্যাদি প্রাণিজাতীয় ও দুগ্ধজাতীয় খাদ্য, ডার্ক চকলেট, বাদাম, শিম জাতীয় উদ্ভিদ ইত্যাদিতে এই উপাদানটি পাওয়া যায়। মিষ্টি কুমড়ার বিচি জিঙ্কের একটি ভালো উৎস।

আয়োডিন: থাইরয়েড থেকে নিঃসৃত এই হরমোনটি থাইরয়েড গ্রন্থির সঠিক পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয়। কোষকলার বিপাকীয় কার্যকলাপ পরিচালনা, খাদ্যকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা, অতিরিক্ত চর্বির বিপাকীয় ব্যবহার, ইস্টোজেন জাতীয় হরমোনকে নিয়ন্ত্রণ করা, শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা, মানসিক ক্ষিপ্রতা এবং বোধশক্তির উন্নতি সাধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই হরমোনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সাধারণত ৫০ বছরের ঊর্ধ্বে মহিলাদের এবং গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে এই হরমোনটির ঘাটতি হতে দেখা যায়। গলগণ্ড রোগটি আয়োডিন ঘাটতির প্রধান লক্ষণ। দীর্ঘদিন ধরে থাইরয়েড গ্রন্থি প্রয়োজনীয় মাত্রায় আয়োডিন উৎপাদনে ব্যর্থ হলে ‘হাইপোথাইরয়েডিজম’ রোগ দেখা দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই

ধরনের ঘাটতি থেকে ‘ক্রিটেনিজম নামক’ বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, শিশু শারীরিক এবং মানসিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়ে পড়ে। ১-৮ বছরের শিশুর প্রতিদিনের চাহিদা ৯০ মাইক্রোগ্রাম, ৯-১৩ বছর পর্যন্ত ১২০ মাইক্রোগ্রাম এবং ১৪ বছর থেকে আরম্ভ করে বয়স্কদের জন্য তা ১৫০ মাইক্রোগ্রাম। সামুদ্রিক বিভিন্ন উদ্ভিদ, মাছ ও অন্যান্য খাদ্য, ডিম, দুধ এবং আয়োডিনযুক্ত লবণ আয়োডিনের প্রধান উৎস।

সেলেনিয়াম: সেলেনিয়াম শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় অপর একটি ‘ট্রেস এলিমেন্ট’। শরীরের প্রায় দু’ডজনেরও বেশি সেলেনোপ্রোটিনের মধ্যস্থ একটি উপাদান হচ্ছে সেলেনিয়াম যে উপাদানটি প্রজনন ক্ষমতা, থাইরয়েড হরমোনের বিপাকীয় কার্যক্রম, ডিএনএ-র সংশ্লেষণজনিত প্রক্রিয়াগুলোকে প্রভাবিত করা ছাড়াও জারণ প্রক্রিয়ায় সংঘটিত কোষকলার ক্ষতি এবং রোগের সংক্রমণ রোধে ভূমিকা রাখে। উপাদানটির অভাবে হৃদপিণ্ডের সমস্যা, মানসিক প্রতিবন্ধতা, মাংসপেশীতে ব্যথা বা মাংসপেশীর দুর্বলতাও দেখা দিতে পারে। প্রতিদিনের চাহিদা ৫৫ মাইক্রো গ্রাম মাত্র। মাছ, গরু-ছাগলের মাংস, হাঁস-মুরগির মাংস এবং ডিম, শস্যদানা, বাদাম এবং বীজজাতীয় খাদ্য থেকেই প্রতিদিনের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রায় সেলেনিয়াম পাওয়া যায়। নখ এবং চুল বিশ্লেষণ করে শরীরে বিদ্যমান দীর্ঘমেয়াদি সেলেনিয়ামের মাত্রা বিশ্লেষণ করা যায়।

তামা: তামা বিভিন্ন প্রকার আমিষ, এনজাইম এবং শ্বাসতন্ত্র সংক্রান্ত কোষকলার মধ্যস্থ এনজাইমগুলোর একটি উপাদান যা শারীরিক বিকাশ এবং বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপাদানটি রক্তের হিমোগ্লোবিনের লোহা সংযুক্তিতে, ত্বকের স্বাভাবিক রং ধরে রাখতে, স্নায়ুর সংকেত আদান-প্রদানে, পরিপাকতন্ত্র, বিপাকীয় কার্যক্রম এবং রোগ-প্রতিরোধক কার্যক্রম পরিচালনায় অবদান রাখে। অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুরা এবং রক্তশূন্যতায় আক্রান্তদের ক্ষেত্রে তামার স্বল্পতা দেখা যায়। উপাদানটির অভাবে রক্তে শ্বেতকণিকার স্বল্পতা, অনিয়ন্ত্রিত হৃদস্পন্দন, হাড়ের সমস্যা, রোগ-প্রতিরোধক তন্ত্রের সমস্যা এবং চুল ও নখের বৃদ্ধিতে সমস্যা দেখা দেয়। সামুদ্রিক খাদ্য, বাদাম, শিম বা মটরজাতীয় বীজ, শাক-সবজি, ফলমূল, গরু বা খাসির যকৃত ইত্যাদিতে এই উপাদানটি পাওয়া যায়। প্রতিদিনের জন্য প্রয়োজন মাত্র ৯০০ মাইক্রোগ্রাম। গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের জন্য মাত্রাটা একটু বেশি হওয়া ভালো।

কোবাল্ট: এটি ভিটামিন বি-১২ এর একটি উপাদান হওয়ায় কোবাল্টের ঘাটতি মানে ভিটামিন বি-১২ এরই ঘাটতি। প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় মাত্রা মাত্র ০.০০০১ মিলিগ্রাম। এটি অস্থিমজ্জার কোষকলাকে উজ্জীবিত করে লোহিত রক্তকনিকা তৈরিতে সাহায্য করে, থাইরয়েড কর্তৃক আয়োডিন শোষণে বাঁধা প্রদান করে এবং বিভিন্ন ধরনের এনজাইমের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। এটির অভাবে জটিল ধরনের রক্তশূন্যতা, শারীরিক ক্লান্তি ও দুর্বলতা, কোনো কোনো অঙ্গের বিশেষ করে হাত ও পায়ের দুর্বলতা ও অসাড়তা অনুভব করা, বমিভাব, মাথাব্যথা, মানসিক বিভ্রমতা, পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা, ওজন হ্রাস, থাইরয়েড গ্রন্থি বড় হয়ে যাওয়া, হৃদযন্ত্রের সমস্যা, স্নায়বিক সমস্যা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। দীর্ঘদিনের ঘাটতি থেকে স্নায়বিক সমস্যা, স্মৃতিশক্তি হ্রাস ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়ার আশংকা থাকে। গরু-ছাগলের যকৃতে, ঝিনুক, মাছ, ডিম, সয়া খাদ্য, সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও মাছ ইত্যাদি কোবাল্টের ভালো উৎস। ডালজাতীয় উদ্ভিদ, বাঁধাকপি, লেটুস ইত্যাদিতে অল্প মাত্রায় কোবাল্ট পাওয়া যায়।

ম্যাংগানিজ: সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন এনজাইম তৈরিতে এবং এনজাইম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিক্রিয়া ঘটাতে এই উপাদানটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। শর্করা, ফ্যাটি এসিড এবং আমিষের বিপাকে, রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে, রক্ত জমাট বাঁধার কাজে, হাড় তৈরি, শক্ত ও মজবুত করতে, মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র ও রোগ-প্রতিরোধক তন্ত্রের সঠিক পরিচালনা, মাইটোকনড্রিয়াতে বিদ্যমান সুপার অক্সাইড নামক ফ্রি রেডিকেলকে বিশ্লেষিত করে ক্ষতিকর প্রভাবমুক্ত করা ইত্যাদি কাজে এই উপাদানটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে উপাদানটির স্বল্পতা হাড়কে দুর্বল ও ভঙ্গুর করে তোলে। পূর্ণ শস্যদানা, বাদাম, চা-কফি, পাতাবিশিষ্ট সবুজ শাক-সবজিতে এটি পাওয়া যায়।

ক্রোমিয়াম: শরীরের শর্করা, চর্বি এবং আমিষ জাতীয় পদার্থগুলোর বিপাকীয় কার্যক্রম পরিচালনায় এই উপাদানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। তাই এই উপাদানটির সামান্য স্বল্পতা থেকেও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এটি রক্তে এইচডিএল-এর পরিমাণ বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। ক্রোমিয়ামের অভাবে রক্তবাহী ধমনি সরু হয়ে ওঠা, উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাওয়া, শরীরের শক্তি কমে যাওয়া, মানসিক অস্থিরতা দেখা দেয়া, শিশুদের শরীরের বৃদ্ধি হ্রাস পাওয়া, সার্জারি থেকে সৃষ্ট ক্ষত বা যে কোনো ধরনের ক্ষত থেকে আরোগ্য লাভ বিলম্বিত

হওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। মাশরুম, ডার্ক চকলেট, পনির, বাদাম, পূর্ণ শস্যদানা, পাকা টমেটো, লেটুস, পেঁয়াজ, গোল মরিচ এবং বিভিন্ন মশলা, ডালজাতীয় শস্য ইত্যাদি থেকে এই উপাদানটি পাওয়া যায়।

ফ্লোরিন: ফ্লোরিনও শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় একটি উপাদান যা বিশেষ করে হাড় ও দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপাদানটির অভাবে দাঁত ও হাড়ের ক্ষয় বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। পানিই ফ্লোরিনের প্রধান উৎস্য তবে সামুদ্রিক মাছ, চা এবং কফিতেও এটি বিদ্যমান। প্রতিদিনের জন্য নিরাপদ মাত্রা ১.৫ মিলিগ্রাম থেকে ৫.০ মিলিগ্রাম।

স্তন ক্যান্সারের উপসর্গ, কারা ঝুঁকিতে

নারীদের স্তন ক্যান্সার একটি জটিল সমস্যা। আবহাওয়া, খাদ্যাভ্যাস ও জীবন-যাত্রার পরিবর্তনের কারণে এই রোগের প্রকোপ বাড়ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বছর ১৫ হাজারের বেশি মানুষ স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি ও উপসর্গ নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বক্ষব্যাধি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. রফিক আহমেদ।

নিম্নে উল্লেখিত নারীদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশি-

* যারা নিয়মিত স্ক্রিনিং করান না।

* বয়স ৪০ বছরের বেশি হলে কোনো উপসর্গ ছাড়াই চিকিৎসকের পরামর্শে ছয় থেকে বারো মাস অন্তর সব নারীকে ম্যামোগ্রাম করাতে হবে। রুটিন পরীক্ষা তো করাতেই হবে।

* ১২ বছরের আগে যদি ঋতুস্রাব শুরু হয়।

* কারও ঋতুস্রাব যদি ৫৫ বছরের পরও চলতে থাকে।

* পারিবারিক ইতিহাস অর্থাৎ মা, খালা, বোন, রক্তের সম্পর্ক যুক্ত। পরিবারের একজনের ক্যান্সার হলে অন্যদের মধ্যে ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়।

* প্রথম সন্তান যদি ৩৫ বছরের পর হয়। স্তনে অন্য কোনো রোগ হয়।

* যাদের সন্তান হয় না অর্থাৎ বন্ধ্যা।

* যাদের উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি।

উপসর্গ

অনেক নারী যাদের বয়স ১৫-৩৫ বছর, বুকের স্তনে বা দুই দিকেই মার্বেলের মতো গোল গোল এক বা একাধিক চাকা অর্থাৎ মাংস দলা থাকতে পারে- যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয়। এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মসৃণ, রাবারের মতো, মার্জিন সহজে বোঝা যায়, নড়াচড়া করে ব্যথা থাকে না।

১৫-৪৫ বছর বয়সী মহিলাদের ১ থেকে ২ সেন্টিমিটার আকৃতির হতে পারে আবার অর্ধ সেন্টিমিটারও হতে পারে। কেন হয় কারণ জানা যায়নি। এটিকে বলা হয় বেনাইন অর্থাৎ শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয়।

স্তন ক্যান্সারের সতর্ক সংকেত- যখন চিকিৎসকের কাছে অতি শিগগির যাবেন

* বুকের মধ্যে শক্ত চাকা, ঘন পুরো বা অমসৃণ, একই স্থানে থাকে।

* স্তন ফুলে গেলে গরম অনুভব হলে, লাল হয়ে গেলে অথবা ত্বক কালো হয়ে গেলে।

* স্তনের আকার, আকৃতি যদি দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে।

* স্তনের ত্বকে যদি গর্ত হয় বা কুঁচকে যায়।

* নিপল যদি বেশি চুলকায়, র্যাশ হয়, ঘা হয়।

* নিপল যদি হঠাৎ করে ফুলে যায় বা অংশ বিশেষ ফুলে যায়।

* হঠাৎ করেই নিপল দিয়ে রক্ত বা সাদা, যে কোনো তরল জাতীয় আঠালো পদার্থ নিঃসরণ হতে শুরু করে।

* হঠাৎ করেই স্তনের মধ্যে ব্যথা শুরু হয়েছে- তীব্র থেকে তীব্রতর

হচ্ছে।

এমনটি হলে- তখন আর দেরি নয়, দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যাবেন।

কী করবেন

* ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

* কায়িক ও শারীরিক পরিশ্রম করুন। প্রতি দিন ঘাম ঝড়িয়ে ৩০-৪৫ মিনিট ব্যায়াম করুন।

* প্রতিদিন ৪ ধরনের ফল ও সবজি খেতে হবে।

* ধূমপান, মদ্যপান থেকে বিরত থাকুন।

* জন্ম বিরতিকরণ পিল সেবন থেকে বিরত থাকুন। বিশেষ করে যাদের বয়স ৩৫ বছর পার হয়েছে।

* ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার পর অনেকেই হরমোন থেরাপি গ্রহণ করেন- সেটি থেকে বিরত থাকুন।

* দুগ্ধবতী মায়েরা অবশ্যই বাচ্চাকে ৬ মাস পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ পান করাবেন। কমপক্ষে ২ বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়াবেন।

* ওষুধে রোগ সারায় আবার ওষুধেই স্তন ক্যান্সার হয়। যদি কেউ টেমক্সিফেন অথবা রেলক্সিফেন ওষুধ দীর্ঘদিন সেবন করেন।

টনসিল ইনফেকশনের লক্ষণ, কী করবেন?

শীতকালে টনসিল একটি জটিল সমস্যা। অনেকেই এই সমস্যায় ভোগেন। টনসিলাইটিস সাধারণত ৩ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। তবে বড়দের ক্ষেত্রে যে একেবারেই হয় না, তা কিন্তু নয়।

টনসিল এক ধরনের লসিকাগ্রন্থি বা লিম্ফয়েড টিস্যু। এতে কোনো

ধরনের ইনফেকশন বা প্রদাহ হলে আমরা এটাকে টনসিলাইটিস বলি। মানবদেহে গলার ভেতরে দুপাশে একজোড়া প্যালাটিন টনসিল থাকে, টনসিলের প্রদাহ বলতে আমরা এর ইনফেকশনকেই বুঝে থাকি।

টলসিল ইনফেকশনের লক্ষণ ও প্রতিকারের উপায় নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নাক-কান-গলা রোগ বিশেষজ্ঞ এবং হেড-নেক সার্জন ডা. মো. আব্দুল হাফিজ শাফী।

টনসিল ইনফেকশনের জন্য ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া উভয়ই দায়ী। ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে প্রধানত বিটা হেমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস দিয়ে হয়। এ ইনফেকশনের অন্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে বারবার ঠান্ডা সর্দি লাগা, পুষ্টিহীনতা, পরিবেশ দূষণ, দেহে অপর্যাপ্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা; অতিরিক্ত ঠান্ডা পানীয়ে আসক্তি ও আবহাওয়ার পরিবর্তন।

লক্ষণ

* টনসিলে গলাব্যথা এবং সঙ্গে খাবার গিলতে সমস্যা হতে পারে এবং শরীরে ক্লান্তি ভাব থাকে।

* এ ক্ষেত্রে গলাব্যথার সঙ্গে জ্বর ১০২-১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠতে পারে। সঙ্গে খাবার গ্রহণে অরুচি এবং বমির ভাব থাকতে পারে।

* গলার সঙ্গে কানের সম্পর্ক রয়েছে। তাই টনসিলের ইনফেকশনে কানে ব্যথা থাকবে এবং গায়ে ব্যথা হতে পারে।

* শিশুদের ক্ষেত্রে অনেক সময় মুখ দিয়ে লালা পড়তে দেখা যায়।

* অনেক সময় মারাত্মক ইনফেকশনে মুখ খুলতে অসুবিধা হতে পারে।

এরকম সমস্যাকে তীব্র ইনফেকশন বা একিউট টলসিলাইটিস বলা হয়। চিকিৎসকের দেওয়া উপদেশ মেনে চললে এবং সঠিক সময়ে নিয়মিত ওষুধ সেবন করলে টনসিলের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

সাধারণত এন্টিবায়োটিক, মাউথওয়াশ, ব্যথার ওষুধ, এন্টিহিস্টামিন ও প্রচুর পরিমাণে পানি পানের উপদেশের মাধ্যমে টনসিলের ইনফেকশনের চিকিৎসা করা হয়। তবে কেউ যদি সঠিকভাবে চিকিৎসা গ্রহণ না করে এবং চিকিৎসকের উপদেশ মেনে না চলে তবে বারবার দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ হয়ে থাকে, যাকে Chronic tonsillitis বলা হয়।

চিকিৎসা শাস্ত্রে Chronic tonsillitis-কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, তবে এই দীর্ঘমেয়াদি ইনফেকশন যদি বছরে চার-পাঁচবার করে পরপর দুই বছর হয়, তবে অসুস্থ টনসিল অপারেশন করিয়ে নেওয়াই শ্রেয় এবং স্থায়ী সমাধান।

দীর্ঘমেয়াদি টনসিলের ইনফেকশন থাকলে অপারেশন না করালে নিন্মুক্ত সমস্যা হতে পারে

* টনসিলের ইনফেকশন চারপাশে ছড়িয়ে টনসিলে পুঁজ জমে ফোড়া হতে পারে।

* টনসিল বড় হয়ে শ্বাস নেওয়ার পথ বন্ধ করে দিলে শ্বাসকষ্টও হতে পারে। এ ছাড়া বড় টনসিলের কারণে খাবার গিলতে গেলে কষ্ট হতে পারে।

* ঘন ঘন ঠান্ডা লাগা থেকে কানে ইনফেকশন হতে পারে।

* রক্তের মাধ্যমে টনসিলের জীবাণু কিডনিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

* বয়স্কদের ক্ষেত্রে একদিকের টনসিল বড় থাকলে এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ থাকলে ক্যানসার হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

তাই এ ধরনের সমস্যা অবহেলা করা উচিত নয়। চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ওষুধের মাধ্যমে যদি সমাধান না হয়, তবে টনসিল অস্ত্রোপচার করানো ভালো এবং নিরাপদ। আমাদের দেশে প্রতিদিন নিয়মিত টনসিলের অস্ত্রোপচার হচ্ছে।

কখন টনসিলের অপারেশন করা যাবে না

* টনসিলে তীব্র ইনফেকশন থাকলে অর্থাৎ জ্বর বা ব্যথা থাকা অবস্থায় অপারেশন করা যাবে না।

* তিন বছরের কম শিশুদের।

* এছাড়াও কারও রক্তে হিমেগ্লোবিনের পরিমাণ কম থাকলে/রক্তশূন্যতা থাকলে।

* হিমোফিলিয়া নামক রক্তরোগের ইতিহাস থাকলে।

* নারীদের মাসিক চলাকালীন অবস্থায়।

আশার কথা, তীব্র ইনফেকশন প্রথমে হলে সে ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ভালো

ওষুধ সেবন, উপদেশমতো ঠান্ডা এড়িয়ে চললে, কুসুম গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে গড়গড়া করলে এবং আদা-লেবু রং চা পান করলে অপারেশনের টেবিলে যাওয়া থেকে অনেকটাই মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

সূর্যালোক থেকে ভিটামিন ডি পেতে কী করবেন?

শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ভিটাামিন ডি। এই ভিটামিনের ঘাটতিতে নানা জটিলতা দেখা দেয়। হাড়ক্ষয়, অস্টিওপরোসিস, প্রজনন সমস্যা, পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম এগুলো ভিটামিন ডি’র ঘাটতির কারণে হয়ে থাকে।

শীতপ্রধান দেশগুলোর মানুষের শরীরে ভিটামিন ডি’র ঘাটতি বেশি থাকার আশঙ্কা আছে। বাংলাদেশের মতো নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মানুষের দেহে ভিটামিন ডি’র ঘাটতি প্রধানত অসচেতনতা প্রসূত।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. শাহজাদা সেলিম।

দেহের মোট চাহিদার ৮০ শতাংশ ভিটামিন ডি আসে সূর্যালোক থেকে। ২০ শতাংশের কম আমরা পেতে পারি খাদ্য উপাদান থেকে, যেমন- স্যালমন মাছ, পোনা মাছ, সামান্য কিছু থাকে মাগুড়-মলা মাছে, দুধ-ডিমে। ভিটামিন ডি পেতে হলে আমাদের সূর্যালোকের ওপরই নির্ভরশীল হতে হবে।

যেভাবে সূর্যালোক থেকে ভিটামিন ডি পেতে পারি

দিনের মধ্যভাগের সূর্যালোক বিশেষ করে গরমকালে সবচেয়ে উপযোগী হতে পারে। দুপুরের কাছাকাছি সময়ে সূর্য যখন সবচেয়ে ওপরের দিকে থাকে, তখন সূর্যরশ্মিতে যে অতি বেগুনি রশ্মি থাকে তা ভিটামিন তৈরিতে বেশি উপযোগী। অন্যদিকে সূর্য পূর্ব-পশ্চিম আকাশে হেলে থাকলে তাতে যে অতি বেগুনি রশ্মি থাকে তা পর্যাপ্ত ভিটামিন ডি

তৈরি করতে পারে না। শীতকালের কম আর্দ্র ও কুয়াশাচ্ছন্ন দিনগুলোয় অথবা শীতপ্রধান দেশে অধিকাংশ সময় সূর্যালোকে যে অতি বেগুনি রশ্মি থাকে, তা ত্বকের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

কতক্ষণ ধরে রোদ পোহাতে হবে তা নির্ভর করবে আপনি পৃথিবীর কোন জায়গায় অবস্থান করছেন। বাংলাদেশের মানুষের জন্য গবেষণাভিত্তিক তথ্য না থাকলেও পৃথিবীর অন্য দেশের গবেষণার সঙ্গে তুলনা করে প্রতিদিন নিয়মিত প্রায় ৩০ মিনিট রোদ পোহানো প্রয়োজন হতে পারে বলে ধরে নেয়া যায়।

এ সময় শরীরের কমপক্ষে ১৮ শতাংশে রোদ লাগতে দিতে হবে। দুপুরের কাছাকাছি সময় মানে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত রোদে যাওয়ার উপযুক্ত সময় হতে পারে। আর বছরের গরমের সময়টুকু অর্থাৎ এপ্রিল-সেপ্টেম্বর, রোদ থেকে ভিটামিন ডি পাওয়ার সবচেয়ে ভালো সময় হবে।

ত্বকের রং সূর্যালোক থেকে ভিটামিন ডি তৈরিতে প্রভাব খাটাই। ত্বকের রং যত গাঢ় হয় (বেশি মেলানিন থাকে), তা সূর্যালোক থেকে অতি বেগুনি রশ্মি প্রবেশে ততবেশি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। অর্থাৎ গায়ের রং যত কালো তাকে ততবেশি সময় রোদে থাকতে হবে।

অনেক খেলোয়ার ও বেশ কিছু নারী ত্বকে সানস্ক্রিন/সানব্লক ব্যবহার করে। এগুলো সূর্যালোক থেকে ভিটামিন ডি পেতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

যতটা সম্ভব বেশি সময় শরীরের বেশি অংশে সূর্যালোক লাগানোর চেষ্টা করবেন যাতে ভিটামিন ডি’র চাহিদা মেটানোর সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

যেসব কারণে শিশুর কানে ব্যথা হয়, কী করবেন?

শিশুদের কানে ব্যথা একটি জটিল সমস্যা। অনেক সময় কানের পর্দা ফেটে

যেতে পারে। আবার সর্দি লেগে কানে ব্যথা হতে পারে। গোসলের সময় কানে পানি গিয়ে তীব্র ব্যথার সঞ্চার হতে পারে। কান ব্যথার সঠিক কারণ নির্ণয় করে চিকিৎসা দিতে পারলে শিশু দ্রুতই সুস্থ হয়ে উঠে।

শিশুর কান ব্যথার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নাক-কান-গলা রোগ বিশেষজ্ঞ এবং হেড-নেক সার্জন ডা. মো. আব্দুল হাফিজ শাফী। সাধারণত ৬ থেকে ১৮ মাসের মধ্যে কানের ইনফেকশন সবচেয়ে বেশি হয়। তিন বছরের কম বয়সি শতকরা ৩০ ভাগ শিশু কোনো না কোনো কারণে কানে ব্যথায় ভুগে থাকেন।

কান ব্যথার কারণ

* ঠান্ডা লাগলে বা সর্দি-কাশি থেকে নাক এবং কানের সংযোগ টিউব ব্লক থেকে কানের পর্দার ভিতরের দিকে তরল পদার্থ জমা হয়ে পর্দা ফুলে ওঠে ব্যথার সৃষ্টি করে।

* কানের ভিতর/এক্সটারনাল ইয়ার ক্যানেল ওয়াক্স বা ময়লা দ্বারা বন্ধ হলে গেলে।

* কানের পর্দার বাইরে এয়ার ক্যানেলে সংক্রমণ হলে ব্যথা হয়।

* কানের ভেতরে ফোঁড়া বা লোমের গোড়ায় ইনফেকশন হলে কানে প্রচুর ব্যথা হয়।

* কানের ভেতরে বহিঃকর্ণ বা কানের পর্দা কাঠি বা কটনবার্ড দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হলে, কানের পর্দা ফেটে গেলে।

* গলাব্যথা বা টনসিলের ইনফেকশন হলে, অথবা দাতে ব্যথা হলে।

কীভাবে বুঝবেন শিশুর কানে ব্যথা হচ্ছে

* কানে ব্যথা হলে শিশু চিৎকার করে কাঁদবে, শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং অস্থিরতা বাড়বে।

* শিশু নিজে নিজের কান ধরবে এবং টানাটানি করবে। কিছু খাবে না, খাবারের রুচি কমে যাবে।

* রাতে ব্যথার জন্য ঘুমাবে না, কান্নাকাটি করবে।

* কাশি ও নাক দিয়ে পানি ঝরতে পারে।

* কানে শুনবে, কিন্তু যারা হাঁটতে পারে তাদের ভারসাম্য বিঘ্ন হয়ে যেতে পারে।

চিকিৎসা

কান ব্যথায় শিশু অস্থির হলে, ঘাড় শক্ত হলে, ক্লান্ত হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়লে তৎক্ষণাৎ জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

* জ্বর ও ব্যথার জন্য বেদনানাশক ওষুধ যেমন-প্যারাসিটামল, আইবুপ্রোফেন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

* ইনফেকশন থাকলে উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, কানের ভেতর শুকনো রাখতে হবে এবং কানে পানি যেন না যায় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

* ব্যথাসহ যদি কান দিয়ে পুঁজ বা রক্ত মিশ্রিত পানি পড়ে তবে কানের ড্রপ দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

* ওয়াক্স বা ময়লা থাকলে অলিভ অয়েল দিয়ে ময়লা নরম করে নাক-কান-গলার চিকিৎসক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

* অনেক সময় নাক-কান-গলার চিকিৎসকরা নাকের ড্রপ দিয়ে থাকেন কানে ব্যথার চিকিৎসায়, সেক্ষেত্রে বিভ্রান্ত না হয়ে প্রয়োজনে বুঝে নিবেন।

কানের সংক্রমণ যথাসময়ে চিকিৎসা না করলে কী জটিলতা হবে

* সংক্রমণ বা ইনফেকশন অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে।

* এয়ারড্রাম (কানের পর্দা) ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

* বাচ্চা কানে শুনবে না।

* কানের পেছনে মাথার হাড়ে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে ম্যাস্টোডাইটিস হতে পারে।

* মেনিনজাইটিস বা ব্রেনের পর্দায় সংক্রমণ হতে পারে।

* শিশুর বাকশক্তির সমস্যা দেখা দিতে পারে।

* কানের ঘনঘন বিশ্রী গন্ধযুক্ত পুঁজ পড়া থেকে ফেসিয়াল প্যারালাইসিস বা মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত হয়ে মুখ বেঁকে যেতে পারে।

কীভাবে কানের ব্যথা থেকে শিশুকে রক্ষা করবেন

* কানের ভেতরে কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করা যাবে না।

* জন্মের পর প্রথম এক বছর ঠান্ডা লাগা থেকে বিরত রাখতে হবে।

* যেসব শিশু ফিডার দুধ খায় তাদের মাথা উঁচু করে দুধ খাওয়াতে হবে। ঘুমন্ত ও শুয়ে থাকা অবস্থায় কখনোই শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো যাবে না।

* শিশুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

* শিশুর সামনে ধূমপান করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

* শিশুকে বুকের দুধ সঠিক নিয়মে বসিয়ে খাওয়াতে হবে।

* এডিনয়েডের বা নাকের পিছনের এক ধরনের গ্লান্ড বড় হলে নাকের সঙ্গে কানের সংযোগকারী টিউব ব্লক হয়ে কানের সংক্রমণ হতে পারে, তাই এরকম সমস্যায় মুখ দিয়ে শ্বাস নিলে বা বাচ্চা হাঁ করে ঘুমালে নাক-কান-গলার চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাতে হবে।

অল্প অল্প জ্বর কেন হয়?

জ্বরের রকমফের আছে। অনেকের কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। আবার কারও ছেড়ে ছেড়ে জ্বর আসে। অনেক সময় হালকা জ্বর থাকে গায়ে, যেটির যন্ত্রণা বেশ কয়েক দিন বইতে হয়।

জ্বরের মাত্রা বহু রোগের নির্দেশ করে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড কনসালটেশন সেন্টারের বক্ষব্যাধি ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. মো. আজিজুর রহমান।

জ্বর নিজে কোনো রোগ নয়, অনেক রোগ প্রকাশ পায় জ্বর রূপে। সুস্থ পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা হলো ৯৮.৬ ফারেনহাইট। যখন শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তাকে জ্বর বলে। অল্প অল্প জ্বর বলতে যখন শরীরের তাপমাত্রা থার্মোমিটারে ৯৯ থেকে ১০১ ফারেনহাইটের মধ্যে থাকে।

শরীরে দীর্ঘদিন (দুই সপ্তাহের বেশি) অল্প অল্প জ্বর থাকতে পারে যে রোগে—

যক্ষ্মা – লিস্ফোমা – কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া – এইচআইভি ইনফেকশন - শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ফোড়া যেমন- ফুসফুসে ফোড়া, লিভারের ফোড়া
– কানেকটিভ টিস্যু রোগ যেমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাটিস, এসএলই – থাইরয়েড রোগ যেমন- হাইপারথাইরয়জ্জিম – কৃত্রিম জ্বর – ওষুধজনিত জ্বর – আরও অন্যান্য কারণে যেমন- ফুসফুসে ক্যান্সার, লিভার ক্যান্সার, কিডনি ক্যান্সার।

দীর্ঘদিন জ্বর থাকলে তার অন্তর্নিহিত কারণ জানার জন্য রোগীর কাছ থেকে বিস্তারিত ইতিহাস নিতে হবে, জ্বর কখন আসে, কীভাবে আসে, কীভাবে চলে যায়, দিনের কোনো ভাগে বেশি জ্বর থাকে, জ্বরের সঙ্গে অন্য কোনো উপসর্গ আছে কিনা।

যেমন— দীর্ঘদিনের অল্প অল্প জ্বর, বিকালের দিকে আসে, রাতে থাকে, সকালে কমে যায়, ঘাম দিয়ে জ্বর ভালো হয়ে যায়, সঙ্গে দুই সপ্তাহের বেশি কাশি থাকে, কখনও কখনও কাশির সঙ্গে রক্ত যায়, শরীরের ওজন কমে যায়, খাবারে অরুচি থাকে, যক্ষ্মা রোগীর সঙ্গে বসবাসের ইতিহাস থাকে, তা হলে সন্দেহ করা হয় তার যক্ষ্মা হয়েছে।
দীর্ঘদিনের জ্বরের ইতিহাসের সঙ্গে রাতে শরীর ঘামানোর ইতিহাস, ক্ষুধামন্দা, শরীরে চুলকানি, জন্ডিসের ইতিহাস, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গ্লান্ড ফুলে যাওয়ার ইতিহাস থাকলে লিস্ফোমা সন্দেহ করা হয়। অল্প অল্প জ্বরের সঙ্গে ডান দিকের ওপরের পেট ব্যথা, মাঝে মধ্যে পাতলা পায়খানার ইতিহাস, পরীক্ষা করে যদি জন্ডিস, লিভার বড় পাওয়া যায় তা হলে সন্দেহ করা হয় লিভারে ফোড়া হয়েছে। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, ঘাম দিয়ে জ্বর কমা, দুর্গন্ধযুক্ত হলুদ রঙের কাশি থাকলে সন্দেহ করা হয় ফুসফুসে ফোড়া হয়েছে।

দীর্ঘ দিনের জ্বরের সঙ্গে যদি খাবারে রুচি স্বাভাবিক থাকাসত্ত্বেও ওজন কমে যায়, যে স্থানে জ্বর হয়েছে সেখানে বসবাসের ইতিহাস, মাটির ঘরে মেঝেতে থাকার ইতিহাস, পাশে গরুর ঘর থাকার

ইতিহাস থাকলে এবং পরীক্ষা করে রক্তশূন্যতা, পেটের উপরিভাগে চাকা থাকলে সন্দেহ করা হয় কালাজ্বর।

দীর্ঘদিনের জ্বরের ইতিহাসের সঙ্গে গিঁটে গিঁটে ব্যথা এবং সকালে ঘুম থেকে জাগার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা বেড়ে যায় এবং মুখে ঘা, গায়ে লাল লাল দাগের ইতিহাস থাকলে কানেকটিভ টিস্যু রোগ যেমন-রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, এসএলই হয়েছে সন্দেহ করা হয়। তাই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে সঠিক ইতিহাস দিয়ে এবং সঠিক পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করে বেশিরভাগ জ্বর ভালো করা সম্ভব।

বার্ধক্যে অবসাদ দূর করতে জেনে নিন করণীয়

আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম গুচ্ছ পরিবার দেখে বড় হয়েছেন। স্বভাবতই তাদের মধ্যে একটা নীরব অপ্রকাশিত প্রত্যাশা রয়েছে যে বৃদ্ধ বয়সে তারা ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনিদের সঙ্গে সময় পার করবেন।

কিন্তু বর্তমানে পেশাগত কারণে চাকরিজীবী ছেলেমেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দূরে সেটেল্ড (স্থায়ী) হয় (একটা বড় অংশই বিদেশে)।

সন্তান-সন্ততি দূরে চলে যাওয়ার ফলে অনেক বাবা-মাকে একাকিত্ব বরণ করতে হয়। একাকিত্বের মাঝে বসে তারা যখন জীবনের সব হিসাব-নিকাশ-প্রত্যাশা মেলানোর চেষ্টা করেন তখন আর হিসাব মেলে না। তাদের জীবনে তখন ভর করে অবসাদ। স্বামী বা স্ত্রী হারানোদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি হয় আরও দুর্বিষহ।

গত বুধবার রাতে আবু মহসিন খানের (ঢাকাই ছবির নায়ক রিয়াজের শ্বশুর) ফেইসবুক লাইভে আত্মহত্যার খবর দেখে ভীষণ ভয় হচ্ছে। উনি যা যা বলে বলে আত্মহত্যা করেছেন তা আসলে বর্তমানে আমাদের দেশের অধিকাংশ বয়স্ক মানুষের জীবনের আত্মকথন।

‘আত্মহত্যা কোনো সমাধান নয়’ —এ বাক্যটা উপদেশ হিসেবে দেওয়া যতটা সহজ, যে কিনা ক্রনিক ডিপ্রেশনে ভোগেন তার জন্য তা মেনে চলা

ততটাই কঠিন। প্রশ্ন হলো— ব্যক্তি হিসেবে তাদের জন্য আমরা কি করতে পারি?

প্রথমত কখনও আমাদের নিজের চিন্তাধারা দিয়ে অন্য কারও পরিস্থিতি বিবেচনা করতে চাওয়াটা উচিত না। আমরা খুব সহজেই বলে দেই, ‘আরে টেনশনের কিছু নেই, এটা কোন ব্যাপার হলো!’।

হয়তো বা আপনার কাছে এটি কোনো ব্যাপার না; কিন্তু যিনি ডিপ্রেশনে আছেন তিনি এ কথা শুনে আরও হীনমন্যতায় ভুগতে পারেন। তার সমস্যাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনুন। কারও কাছে নিজের সমস্যা প্রকাশ করতে পারাটাও আসলে অনেক বিশাল সাপোর্ট হিসেবে কাজ করে। যেহেতু আপনি প্রফেশনালি ট্রেইন্ড না, কোনো পরামর্শ দিতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

দুই. মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে যারা কাজ করছেন, তাদের দরকার কাজের পরিধি বাড়ানো। বয়স্কদের দিকেও নজর দেওয়া ও তাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। বয়স্ক নারী ও পুরুষের শারীরিক পরিবর্তন যেমন মেনোপজ বা দুরারোগ্য ব্যাধিও যে বিষণ্নতার কারণ হতে পারে মানুষকে এই ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত তরুণদের সচেতন করা।

কিছু প্রচলিত বাক্য যেমন ‘বুড়া হইছে তো তাই মাথাটাও গেছে’, ‘বয়স দিন দিন মনে হয় কমে’ থেকে বের হয়ে আসতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। এ ধরনের কথাবার্তা বয়স্কদের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে যারা কাজ করেন তাদেরকে সামাজিক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

তিন. আমাদের দেশে ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা-মা অবসরে গেলে অন্য কোন কাজে যোগ না দিয়ে শুধু আরাম আয়েশ করতে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের জীবনে ব্যস্ততা প্রয়োজন। চাকরি জীবনে সারাদিন অফিস করে বাসায় আসলে যতটা প্রাধান্য পেতেন। রিটায়ারমেন্টের পর সারাদিন ঘরে থাকলে দেখা যায় সে পরিমাণ প্রাধান্য পাচ্ছেন না (যা খুবই স্বাভাবিক)। হুট করে এ পরিস্থিতির সঙ্গে মানাতে গিয়ে অনেকেই হীনমন্যতায় ভোগেন। ভাবেন, ‘চাকরিতে থাকতে আমাকে অনেক সম্মান ও আদর-আপ্যায়ন করা হতো, এখন আর কেউ আগের মতো ভালোবাসে না’।

চার. আপনি যদি পিতামাতার কাছ থেকে দূরে থাকেন, তা হলে চেষ্টা করুন সবসময় তাদের খোঁজখবর রাখতে। বেশি না, প্রতিদিন এক-দুই মিনিটই যথেষ্ট। যদি তাও ম্যানেজ করতে না পারেন তা হলে অন্তত সপ্তাহের ছুটির দিনে কথা বলুন। আর যদি তাও না পারেন, তা হলে

আপনার আশপাশে যার বাবা-মা নেই তাদের সঙ্গে একটু কথা বলুন; তারা হয়তো তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে একবারের জন্য কথা বলতে হাজারও মাইল পাড়ি দিতে রাজি। তাদের সঙ্গে কথা বলে বুঝবেন আপনি এখনও কতটা ভাগ্যবান।

পাঁচ. বয়সকালে কেউ স্বামী অথবা স্ত্রী হারালে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যিনি বেঁচে থাকেন তিনি চূড়ান্ত একাকিত্বে ভোগেন। আমাদের সমাজে বৃদ্ধবয়সে বিয়ে করাটা এক ধরনের ট্যাবু। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার বাবা অথবা মা হওয়ার আগে তারা একেকজন মানুষ। যৌন চাহিদার চেয়ে পারস্পরিক সাহচর্যটা এ ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। সে বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত।

ছয়. আমাদের দেশে একটা প্রবণতা আছে— বাবা-মায়েরা আমৃত্যু ছেলেমেয়েদের জন্য স্যাক্রিফাইস করে যাবেন। অনেক পিতামাতা নিজের জন্য কোনো সঞ্চয় না রেখে সব কিছু ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের জন্য খরচ করে ফেলেন, অনেকে আবার সঞ্চিত সব অর্থ ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেন। এ দুটি বিষয়ই বয়সকালে তাদের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে। একেবারে অর্থশূন্য হয়ে পড়ার কারণে অনেক সময় চিকিৎসা বা দৈনন্দিন খরচের জন্য তাদের ছেলেমেয়ের কাছে হাত পাততে হয়, যা কিনা একপর্যায়ে তাদের জন্য যন্ত্রণার কারণ হয়ে ওঠে।

সুতরাং নিজের শেষ বয়সের চিকিৎসা, প্রাত্যহিক ব্যয় ও বিনোদনের জন্য পরিমিত অর্থ হাতে রাখাই পিতামাতার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ।

বয়স্করা সম্ভব হলে নিজেদের স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে সম্পৃক্ত করতে পারেন। অন্যের মুখে হাসি দেখতে পাওয়াটা অনেকটা নেশার মতো। হয়তোবা এখান থেকে অন্যের উপকারের পাশাপাশি সেলফ সেটিসফেকশন বা জীবনের নতুন লক্ষ্য খুঁজে পেতে পারেন। চাকরি বা সংসারের ঘানি টানতে টানতে হয়তো বা জীবনের অনেক ইচ্ছাই পূর্ণতা পায়নি, অবসর সময়ে সে অপূর্ণ শখ পূরণের চেষ্টা করতে পারেন।

লেখক: জাফর আহমেদ
স্টোনি ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র।
ও
সানজিদা সুলতানা রুপা
কাউন্সেলিং সাইকোলজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]: [redacted]

[redacted]:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]?

[redacted]

শরীরে পানি ও লবণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে কিডনি ও মূত্রতন্ত্র বিশেষ অবদান রাখে। বর্জ্য নিঃসরণে মূত্রতন্ত্রের অপর্যাপ্ত ক্ষমতা বা অক্ষমতায় এসব বর্জ্য শরীরে জমা হয়ে আমাদের শরীরের সুস্থ আবহকে বিঘ্নিত করে। একজন মানুষ ২৪ ঘণ্টায় সাধারণত ২ দশমিক ৫ থেকে তিন লিটার পানি বা পানীয় পান করে থাকেন। কিডনির কাজ করার ক্ষমতা স্বাভাবিক থাকলে, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার খুব বড় তারতম্য না হলে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় এক হাজার ৫০০ সিসি প্রস্রাব কিডনি তৈরি করে থাকে।

আমাদের শরীর থেকে কিছু পানি ঘাম আকারে, কিছু পানি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে, কিছু পানি মলের সঙ্গে বের হয়ে যায়। যেহেতু আমাদের প্রস্রাবের থলির স্বাভাবিক ধারণক্ষমতা ৩০০ সিসি, তাই স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ ২৪ ঘণ্টায় পাঁচবার প্রস্রাব করে থাকে। সাধারণত দিনে চারবার আর রাতে একবার।

তবে নানাবিধ স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক কারণে বারবার প্রস্রাবের প্রবণতা দেখা দিতে পারে, আবার কমেও যেতে পারে। যদি আমরা অতিরিক্ত পানি বা তরলজাতীয় খাবার খাই, তবে প্রস্রাবের পরিমাণ বেশি হয়, বারবার প্রস্রাব হয়। বারবার প্রস্রাব হয় ডায়াবেটিসের কারণে।

অন্যদিকে পুরুষের ক্ষেত্রে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বয়সজনিত স্বাভাবিক পরিবর্তন হিসেবেই বৃদ্ধি ঘটে প্রোস্টেট গ্রন্থির। প্রোস্টেট গ্রন্থি প্রস্রাব প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে প্রস্রাবের থলি সবসময় সম্পূর্ণ খালি হয় না। আর বৃদ্ধি পাওয়া প্রোস্টেট সৃষ্টি করে প্রস্রাবের থলির মুখে এক ধরনের অস্বস্তি। বয়োবৃদ্ধির কারণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রস্রাবের থলিরই ধারণক্ষমতা কমে যায়। বারবার প্রস্রাব করার প্রবণতা বেড়ে যায়।

অনিদ্রার কারণে কি ডায়াবেটিস হতে পারে?

আমরা অনেকেই শুনে থাকি যে, ইনসোমনিয়া বা অনিদ্রার কারণে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দেয়। আর এগুলোর মধ্যে বিপাকীয় কার্যক্রম

ব্যাহত, গ্যাস্ট্রিক, স্ট্রেসসহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ ছাড়া অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন তৈরি হয় যে, অনিদ্রার কারণে ডায়াবেটিস হতে পারে কিনা?

এ বিষয়ে ভারতীয় গণমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইনসোমনিয়া বা পর্যাপ্ত ঘুম না হয়ে থাকলে তা বিপাকীয় ক্রম ব্যাহত করতে পারে। এ ছাড়া অপর্যাপ্ত ঘুমের কারণে কর্টিসলের মতো স্ট্রেস হরমোন নিঃসরণ হয়ে থাকে। আর এটি ইনস্যুলিন প্রতিরোধের দিকে পরিচালিত করতে পারে এবং ফলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়।

এই স্ট্রেস হরমোনগুলো কার্বোহাইড্রেটযুক্ত ও চিনিযুক্ত উচ্চ খাবার এবং পানীয়গুলোর প্রতি আপনার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এতে করে ওজন বাড়তে পারে এবং এভাবে একপর্যায়ে টাইপ-২ ডায়াবেটিস হতে পারে।

শুধু তাই নয়, অপর্যাপ্ত ঘুম লেপটিন হরমোনকেও কমিয়ে দেয়, যা শরীরে কার্বোহাইড্রেটের আকাঙ্ক্ষা বাড়ায়। আর কার্বোহাইড্রেটের বিপাক নিয়ন্ত্রণের জন্যও লেপটিন দায়ী।

তাই আপনি যদি নিদ্রাহীনতায় ভুগে থাকেন, তবে চিনির মাত্রার ওপর বিশেষ নজর রাখতে হবে।

আমেরিকান একাডেমি অব স্লিপ মেডিসিন এবং স্লিপ রিসার্চ সোসাইটির মতে, সুস্থ ও ফিট থাকার জন্য প্রতি রাতে অন্তত সাত ঘণ্টা ঘুমানো গুরুত্বপূর্ণ। আর দিনেরবেলা ক্লান্ত বোধ করলে তা রাতে খারাপ ঘুম হওয়ার একটি প্রধান লক্ষণ।